Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

অকাল বৃষ্টিতে চাষির মাথায় বজ্রাঘাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর : 'যদি বরষে অঘনে রাজা যায় মাগনে / যদি বরষে পৌষে কড়ি হয় তুষে / যদি বরষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।' খনার বচন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। অঘ্রানে হঠাৎ বর্ষায় শস্যগোলা জেলার দুটি অর্থকরী ফসল ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লো। সোনার ফসল জেলাতে ৭৫ ভাগ উঠলেও ২৫ ভাগ ধান জলের তলায়। আর ৭৫ ভাগ আলু লাগানো হলেও লোকসানের বহর জলের তলায় তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল জেলার সবজি চাষিরাও। যেখানে সবজি চাষ হয় পাঁচ হাজার হেক্টরে।

এবার কৃষি দপ্তর ৬৮ হাজার একর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল। তার মধ্যে আলু লাগানো হয় ৪৮ হাজার হেক্টর জমিতে। গত ২০২১ সালের পুনরাবৃত্তি। সেবারেও আলু চাষিরা দু'বার আলু চাষ করেন। এবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া আলু বীজের কালো বাজারি। জামালপুরের আলু চাষি সুকুমার ডকাল জানান আলু বপন করার সময় সার বেশি দামে কিনলেও বীজের দাম ছিল ১৫০০-১৮০০ টাকা বস্তা। এখন মওকা বুঝে সেই বীজের দাম বলছে চার হাজার টাকা বস্তা। চাষি আদিত্য মণ্ডল জানালেন এখনও পর্যন্ত বিঘা পিছু ২৫ হাজার টাকা জলের তলায় চলে গেছে। আবার যদি রোপণ করতে ক্ষতির বহর বেড়েই চলে চাষি বাঁচবে কী নিয়ে? আলুর জমিতে যে চাপান পড়েছে তাতে অন্য চাষ করা যাবে না। বাধ্য হয়েই আলু চাষ করতে হবে। আলুর দাম কয়েক বছর না পাওয়ায় আলু চাষ এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে মেমারি, জামালপুর ও পূর্বস্থলি ব্লক। মেমারির চাষি সঞ্জয় মাঝি জানালেন বীজ নিতে ভোর থেকে লাইন দিয়েছি। দর হাঁকছে গলা কাটা। তবুও পাব কিনা জানি না। আবার ঋণ নিয়ে চাষ করে আখে জলে পড়ে যাব। সব থেকে অকুস্থলে পড়েছে ভাগ চাষিরা। পূর্বস্থলি ব্লকে ভাগে করা এক আলু চাষি আত্মঘাতী হয়েছেন। পরিবারের দাবি ঋণ করে ভাগের জমি দু বিঘা চাষ করেছে সবটাই জলের তলায়।

এদিকে পাকা ধানে বৃষ্টির মই চাষিকে বিপাকে ফেলেছে। সব থেকে ক্ষতির মুখে পড়েছে খাস ধান এবং নামী লাল স্বর্ণ ধান। রায়না, খন্ডঘোষ ব্লকে খাস বা গোবিন্দভোগ, গলসী, সদর, কাটোয়া, আউশ গ্রাম, মঙ্গলকোট প্রভৃতি ব্লকের ৩০ ভাগ ধান জলের তলায়। কৃষি

—এরপর চারের পাতায়

সম্প্রীতি দিবস পালন জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই আজ সম্প্রীতি দিবস পালিত হয়েছে। মিছিল, মিটিং, পথসভার মধ্য দিয়ে এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে জেলার সর্বত্রই মিছিল ও পথসভা হয়েছে। কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সন্ধ্যায় সুলতানপুরে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকুল শিকদার, শ্যামল পাল রাখহরি সেন প্রমুখ। গলসীতে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, মুস্তাক হোসেন, অমিতাভ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন সুকুমার দাস। মেমারি পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে লরি ইউনিয়ন অফিস থেকে চকদিঘি মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল হয়।

৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে দেওয়াল লিখন।

৯ ডিসেম্বর সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান শহরের দুবরাজ থেকে সোলাপুকুর মসজিদ পর্যন্ত এক শান্তি-সম্প্রীতি মিছিল হয়। ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

জল থেকে ধান তুলে শুকাচ্ছেন কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ ডিসেম্বর : নিম্নচাপের বৃষ্টিতে চরম বিপাকে কৃষকরা। কাটা ধানের জমিতে বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় কাটা ধান এখন কৃষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই তারা মাঠে নেমে পড়েছেন। যতোটুকু ধান বাঁচানো যায় সেই লক্ষ্যে তাঁরা এখন জমির জল থেকে কাটা ধান ছেঁকে তুলছেন। পাশাপাশি তা উঁচু জায়গা বা রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে শুকাতে দিচ্ছেন। এই ছবি কালনা মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের মাঠে মাঠে দেখা যায়।

কালনায় তোলা নিজস্ব চিত্র।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকা দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ ডিসেম্বর : মৃত ভোটার ও ভুয়ো ভোটার বাতিল করে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা করার দাবি জানাল সিপিআই(এম)। ৭ ডিসেম্বর বর্ধমানের কার্জন গেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সিপিআই(এম) নেতা তাপস সরকার, নজরুল ইসলাম, সুদীপ্ত গুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এদিনই এসডিও-কে ২০০০ জন মৃত সহ ভুয়ো ভোটারের তালিকা দেওয়া হয়। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এদিন অভিযোগ করেন, বর্ধমান শহরে প্রতি বুথে গড়ে ৩০-৪০ জন মৃত সহ ভুয়ো ভোটার থেকেই যাচ্ছে। বার বার নির্দিষ্ট অভিযোগ জানালেও সংশোধন করা হচ্ছে না। জাল ভোট দেওয়ার জন্য শাসকদলকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই কি এমন হচ্ছে? এই প্রশ্নই সামনে এসেছে এদিন। এদিন দীপঙ্কর দে'র নেতৃত্বে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অভিনব উদ্যোগ সকালের টিফিন চালু করলো রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ

কিশোর মাকর : মিড ডে মিল আগেই ছিল। এবার নিজেদের উদ্যোগে চালু হলো সকালের টিফিন। এক অভিনব মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে বর্ধমান শ্যামসায়র পাড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ। ১ ডিসেম্বর থেকে স্কুলে চালু হল শিশুদের জন্য প্রাতরাশ। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথায়, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করেছেন, সকালে স্কুলে আসার সময় পড়ুয়ারা বেশিরভাগই বাড়িতে কিছু না খেয়েই চলে আসে। এদিকে স্কুলের মিড-ডে মিল দেওয়া হয় ১০

টার পর। ফলে আগের দিনের রাত থেকে পরের দিন পর্যন্ত অনেকটা সময় তাদের প্রায় কিছু না খেয়ে থাকতে হয়। এতে তাদের পুষ্টিরও ঘাটতি থেকে যায়। পাশাপাশি কিছু পড়ুয়া টিফিন আনে, কিছুজন আনে না। টিফিনের সময় কিছুজন যেমন খাবার খায়, কিছুজন খায় না। এটা অস্বস্তিকর। তাই 'সকালের পুষ্টি সকলের পুষ্টি' এই ভাবনাকে সামনে রেখে শিক্ষিকা লাবণ্য রায় প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরী ক্ষুদে পড়ুয়াদের জন্য প্রাতরাশ দেওয়ার আর্থিক দায়ভার নিয়েছেন। এই উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের এক চিকিৎসক বন্ধু রাসবিহারী ধনী। এখনও পর্যন্ত মাসে ২৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। স্কুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা করেন বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কুল পরিদর্শক স্বপন দত্ত সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট জনেরা। স্কুলে ২০০ জন ছাত্র ছাত্রী আছে। সাতদিনের প্রাতরাশের তালিকায় আছে— পাউরুটি ডিম, বাটার, জ্যাম, কলা, রসগোল্লা, দুধ এবং পুষ্টিকর পানীয়। ছাত্র ছাত্রীরাই নিজেদের মধ্যে এই খাবার বিতরণ করছে।

আত্মঘাতী কৃষক পূর্বস্থলিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ ডিসেম্বর : সদ্য আলু লাগানো ক্ষেত নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়ায় হতাশায় ৮ ডিসেম্বর রাতে আত্মহত্যা করলেন একজন কৃষক। মৃত রূপ সনাতন ঘোষের (৪৫) বাড়ি পূর্বস্থলি থানার নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতনি উত্তর পাড়ায়। ৯ ডিসেম্বর কালনা মহাকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়। মৃতের দাদা অমল ঘোষ জানান, ভাই পাঁচ বিঘে জমিতে চাষ করে সংসার চালাতো। তার বাড়িতে

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

ফ্যাসিজমের পদধ্বনি

সাম্প্রতিককালে এদেশে ঘটে চলা ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা ক্রমশ ফ্যাসিবাদী পথেই দেশ চালাতে চাইছে। অসহিষ্ণুতা ক্রমবর্ধমান। বৈচিত্র্যের সাধনা নয়, বলপূর্বক একীকরণ, তা 'এক দেশ এক ভোট' যে নামেই হোক না কেন, এখন শাসকের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। শাসকঘনিষ্ঠ কর্পোরেটের মালিকানায় চলে গেছে সংবাদপত্র। ফলে সাংবাদিকতা ও চাটুকারিতা অভিন্ন হয়ে গেছে। মোদী সাংবাদিক বৈঠক করেন না। ক্ষমতাবান রাজনীতিক যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তখন সাংবাদিকরা তাঁদের অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে সাহস করেন না, 'ললিপপ' প্রশ্ন করে দায় সারেন। মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলো পেছনে ঠেলে দিতে সুকৌশলে 'নন ইস্যু'-কে 'ইস্যু' বানানো হয়। ফলে বেকারির থেকে বড় করে দেখানো হয় গীতাপাঠ, মূল্যবৃদ্ধির থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় অসবর্ণ বিবাহ, ঋণভারে জর্জরিত কৃষকের আত্মহত্যা খবর হয় না। হিজাব পরা বা গো-মাংস ভক্ষণ উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে। এর অনেকটাই আবার পরিকল্পিত, আক্রমণ। ২০১৫ সালে গো-মাংস রাখার অপরাধে যে মহম্মদ আখলাখকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা গোমাংসই ছিল না। মানবাধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত। মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নিতে মুক্তচিন্তক মানবাধিকার কর্মীদের শাসকের রোষানলে দগ্ধ হতে হয়। তাই তিস্তা শীতলাবাদের বিরুদ্ধে জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, গৌরী লঙ্কেশকে খুন হতে হয়।

গত শতকের প্রথমার্ধে প্রথমে মুসোলিনির ইতালি ও পরে হিটলারের জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের যে চাষ শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পরও তা নির্মূল হয়নি। উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারী শাসক এই মতকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। কারণ ফ্যাসিবাদ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চায়, আর প্রতিবাদ বরদাস্ত করলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয় না। মুশকিল হলো এসবই হচ্ছে 'ভারতমাতার' জয়ধ্বনি দিয়ে। সাংবাদিক নীতিশ কাপুর একবার বলেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ দেশাত্মবোধে আটকে থাকেনি, উগ্রদেশপ্রেমে নিজেকে পাল্টে নিয়েছে। এটা ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় কৌশল, এই পথেই জার্মানির মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করে হিটলার। এর মোকাবিলা করতে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য, বহুত্ববাদ ধর্মনিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একজোট হতে হবে। মনে রাখতে হবে। ফ্যাসিবাদকে চেনা খুব শক্ত না হলেও তার প্রতিরোধ করা কঠিন। কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, ইতিহাসের এই শিক্ষা নিয়েই পথসন্ধান জরুরি এ দুঃসময়ে।

নতুন করে এঙ্গেলস পাঠ

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ছিলেন কার্ল মার্কসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। পৃথিবীর জ্ঞানজগতের বিকাশে দুই মনীষীর এই অসাধারণ সমন্বিত রূপের আর কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ বোধহয় নেই। এঙ্গেলসের জন্ম সাবেক প্রাশিয়ার (এখনকার জার্মানি) বামেন শহরে ১৮২০ সালের ২০ নভেম্বর। বনেদী বাড়ির ছেলে। পারিবারিক ব্যবসা ছিল সুতোকল। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তাদের কারখানা ছিল। নাম ছিল Epmen and Engels Cotton Plant। স্বাভাবিক কারণেই তাদের পরিবার প্রাশিয়ার রাজার প্রতি অনুগত ছিল। তবে অল্প বয়স থেকেই ধর্ম ও ধনতন্ত্রবাদের প্রতি এঙ্গেলসের ছিল বেসুরো মনোভাব। কঠোর সমালোচক। কৈশোরে তাকে প্রাশিয়ার ব্রেমেন শহরে পাঠানো হয়। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত সেখানে তিনি শিখতে গিয়েছিলেন রপ্তানি বাণিজ্যের কলাকৌশল। কিন্তু সেখানেও ফল হল উল্টো। সেখানে তিনি ফ্রেডরিখ অসওয়াল্ড ছদ্ম নাম নিয়ে সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। সেখানে তিনি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেন এবং সদ্য গড়ে ওঠা জার্মানির সাহিত্য আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৮৪১ সালে এঙ্গেলসের নাম নথিভুক্ত হয় বার্লিনের সেনাবাহিনীতে এক বছরের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। সেখানে থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শুনতেন। 'অসওয়াল্ড' ছদ্মনামে লেখাগুলি তাকে বুদ্ধিজীবী মহলে জায়গা করে দেয় যার সুবাদে তিনি 'The Free' নামক ইয়ং হেগেলিয়ান ক্লাবে ঢোকার অনুমতি লাভ করেন। এই ক্লাবে প্রায়ই আসতেন কার্ল মার্কস। ইয়ং বা বামপন্থী হেগেলিয়ানরা ছিলেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের প্রগতিশীল অনুগামী। এঁদের বিকাশ হয় ১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লব এবং ১৮৪৮ সালের ইওরোপে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিপ্লবে। এঁরা ছিলেন তখনকার ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতির মিশ্রণের ফলাফল। পরে এই ইয়ং হেগেলিয়ানদের নেতা রূপে আবির্ভূত হন কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ং হেগেলিয়ান হিসেবে থেকে এবং

ম্যানচেস্টারে পারিবারিক কারখানায় থেকে তিনি ক্রমশ ধনতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, বিশেষত উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানার দিকটি তাঁর নজর কাড়ে কারণ সেই ধারণার মধ্যে সাম্যবাদী সমাজের বীজ নিহিত আছে। ম্যানচেস্টারে শিল্পবিপ্লবের সময় এঙ্গেলস দেখেছিলেন কিভাবে সম্পদের অসম বন্টন হচ্ছে—এক শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে শ্রমিকের কষ্টার্জিত সম্পদ। এঙ্গেলস দেখেছিলেন নারী সন্তান ধারণে অসমর্থ হয়ে যাচ্ছে, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। পুরুষ শ্রমিক না খেতে পেয়ে ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছে, তাদের দেহের খাঁচা যেন ভেঙে যাচ্ছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে, মানুষ তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। শিল্প বিপ্লবের কোনো সুফল শ্রমিকের ঘরে যাচ্ছে না—তা শুধু বুর্জোয়াদের আরও পুঁজি সঞ্চয়ে সহায়ক হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি লিখলেন ১৮৪৫ সালের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Condition of the Working Class in England'। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান কিভাবে নগর পরিকল্পনায় শ্রেণিভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বসতি নির্মাণ করে শ্রেণি বিরোধ ও বিপ্লবের পটভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি আসলে কার্ল মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনা ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়। এই গ্রন্থেরই সূচনাতে তাঁরা এক যুগান্তকারী বাক্য লেখেন, "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের ইতিহাস হলো শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।" রাষ্ট্রের উৎপত্তিই হয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের ফলে, বিলুপ্তিও হবে শ্রেণি সংগ্রামের ফলে। এই যুগান্তকারী গ্রন্থেই তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম চুরি করে পুঁজিপতি তাদের পুঁজি বৃদ্ধি করে। এখান থেকে শ্রমিকদের তথা সমগ্র খেটে-খাওয়া মানব জাতির মুক্তি ঘটবে যদি শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধন করে সর্বহারা শ্রেণিগুলি উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত এ্যান্টি-ডুরিং গ্রন্থে মার্কসবাদের মতাদর্শগত ঐশ্বর্য পূর্ণতা পায়। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস কেবলমাত্র মার্কসবাদের পক্ষই সমর্থন করেননি, সর্বহারাদের বৈপ্লবিক তত্ত্বের অনেকগুলো নীতিগত প্রশ্নও বিকশিত করে তোলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি সাধারণীকরণ করেন, তাদের সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতা, বিশ্ববিজ্ঞানের বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সব সাফল্যগুলিকে। পরে ১৮৮০ সালে লেখেন 'কল্পলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' যেটি ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস সাঁসিমোঁ, শার্লে ফুরিয়ে এবং রবার্ট ওয়েনের ঋণ স্বীকার করেন সর্ব প্রথম এক বিকল্প সমাজভাবনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁদের চিন্তা যে কাল্পনিক ছিল তা

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষা : গতি যখন দুর্গতি

নয়ন কোনার

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক প্রয়োজন। বিজ্ঞপ্তি বের হল। ক্লাসপিছু সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হবে ৩০০ টাকা। এই ২০২৩ সালে!

এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা যে অধঃপতনের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে তা বোঝার জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটিই বোধহয় যথেষ্ট। শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে তাঁরা শিক্ষাকে কতটা মূল্যবান মনে করেন এবং কোন আকর্ষণে আমাদের মেধাসম্পন্ন শিক্ষায় আগ্রহী হবে—এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই একটি বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্ট।

প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, গবেষণা, সমস্ত পর্যায়েই চূড়ান্ত ডামাডোল চলছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একে ধরা সম্ভব নয়। আমরা কেবল কিছু কিছু জায়গা ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। লিঙ্গসাম্যের দাবিতে এ আলোচনায় কিছু কিছু বাংলা শব্দের পরিবর্তে 'টিচার' 'গার্জেন' ইত্যাদি লিঙ্গনিরপেক্ষ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হবে।

এমন নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা আগে ত্রুটিহীন ছিল। তবে এমন বিপর্যস্ত দশা আগে কখনও দেখা যায়নি। হাতের কাছে সমস্ত ডেটা লভ্য নয়, তাই সংশ্লিষ্ট মহলের মানুষজনের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হয়েছে। শিক্ষার এই অবক্ষয়ের পিছনে যে কারণগুলো খালি চোখেই ধরা পড়ে সেগুলো হল নিয়ামকদের সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার অভাব, কোভিড-উত্তর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, মোবাইল ও ইন্টারনেটে আসক্তি, শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর জীবিকা নির্বাহের আতঙ্কজনক অনিশ্চয়তা। এগুলো শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া থেকে আগা অব্দি টালমাটাল করে দিচ্ছে।

বুনিয়াদি স্তরে, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, পাশফেল প্রথা তুলে দেয়া হয়েছে। এটা হতে পারত যদি আমাদের শক্তি, চাপমুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জন করতে পারত। কিন্তু সদিচ্ছার অভাবে টিলেমি প্রকট হয়ে উঠল। মিড-ডে মিল থেকে শুরু করে বইখাতাপোশাক-প্রদান ইত্যাদি হরেক রকম কল্যাণকর প্রকল্পের বদান্যতায় ড্রপ-আউট কমল, কিন্তু পড়াশোনার কোনো উন্নতি হলো না। উল্টে, কামাইয়ের প্রবণতা বেড়ে গেছে। একজন শিক্ষার্থীর অবচেতনে গেঁথে গেছে যে, সে স্কুলে যাক বা না যাক, ক্লাস নাইনে উঠবেই। ক্লাসরুমের গমগমে ভাব আজ উধাও। মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত, বাঙালি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নিয়ামকরা পরোক্ষভাবে এই বেসরকারিকরণে মদত দিলেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবা, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে, সরকারের প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। সেটা হল না। যাইহোক, গার্জেনদের চাহিদার যোগান দিতে যত্রতত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠেছে, সেখানে পোশাক থেকে শুরু করে বইপত্র সবই পণ্য। এমনকি শিক্ষাও। ঝাঁ-চকচকে বিল্ডিং মানেই ভালো স্কুল নয়। স্বল্প বেতনে শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের টিচার হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁরা আদৌ শিক্ষকতার মতো একটি পেশার যোগ্য কিনা তা বাছাইয়ের কোন ছাঁকনি নেই। সেখানে নাকি পড়াশোনার প্রবল 'চাপ'! কিসের চাপ? সিলেবাসের, প্রোজেক্টের। শিক্ষার্থীরা এই আশঙ্কাজনক চাপের মাঝে সত্যিই কিছু 'শিখতে' পারছে কিনা তা নিয়ে কারোর হেলদোল নেই। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' গল্পের পুনরভিনয় চলছে। গার্জেনরা তাতেই শিহরিত। এদিকে তোতা যে কাগজ-কলমের চাপে মৃতপ্রায় সেদিকে কারো হুঁশ নেই। সন্তানদের মুখে chi chi English শুনেই তাঁরা তৃপ্ত।

সরকারি ব্যবস্থায় ফিরি। ক্লাস নাইনে ওঠার পরও কামাইয়ের অভ্যাস অব্যাহত। সম্পন্ন পরিবারের সন্তানদের প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হয়। স্কুল যে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের আঙিনা—এ বোধ ক'জন তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও জাগ্রত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেবল সাইকেল আর টেস্ট পেপার দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলের দায়িত্ব খালাস হয়ে যায় না।

পরীক্ষায় অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আধিক্য। সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু সেসব প্রশ্ন 'কমন' পাওয়া যায়, মুখস্থ করলেই কেল্লা ফতে, মাথা খাটানোর প্রয়োজন নেই। দেদার নম্বর। দুঃখজনক হলেও সত্যি, সব সময় মুখস্থ করারও প্রয়োজন পড়ে না। পরীক্ষার হলের, এবং হলের বাইরেও, পরিবেশ তাদের নম্বর তোলার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়, সেসব নিয়ে মিডিয়া দিন কয়েকের জন্য শোরগোল তোলে। ব্যস, তারপর আবার সবকিছু পূর্ববৎ।

বছরভর ফাঁকা ক্লাসরুম এবং শিথিল পরীক্ষা-পরিবেশেই গল্প শেষ নয়। নিয়ম অনুসারে স্কুলে ছুটির সংখ্যা রবিবার বাদে মোট ৬৫, কিন্তু গরমের সময় ছুটি হয়ে ওঠে আক্ষরিক অর্থেই অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অবশিষ্ট কাজের দিন মাঝে মাঝেই টাল খায় টিচারদের ক্যাজুয়াল ও মেডিকেল লিভে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপুল অংশের শিক্ষিকার চাইল্ড কেয়ার লিভ। সবমিলিয়ে লেখাপড়ার দিনসংখ্যা ভয়ানক হ্রাস পায়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও একই ছবি। বাড়তি ঝামেলা বলতে ওই স্তরে বর্তমানে প্রায় সমস্ত শিক্ষার্থীর হাতে মোবাইল। মোবাইল এবং ইন্টারনেট যদি ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যেত তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হত। কিন্তু হল উল্টোটা। পঠনের সময়ও মোবাইল ব্যবহাররত শিক্ষার্থীদের হামেশাই দেখা যাচ্ছে। টিচার লিখছেন বোর্ডে, শিক্ষার্থী লিখছে হোয়াটসঅ্যাপে, বা চোখ রাখছে রিলে। স্নাতক স্তরে এ সমস্যা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছাড়া শিক্ষার্থীদের স্কুল চত্বরে দেখা পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্নাতক স্তর ত্রিফলা অস্ত্রে বিদ্ধ। সদিচ্ছার অভাব এবং নতুন শিক্ষা নীতির পরিকল্পনাহীন প্রয়োগ। অধ্যাপক নন্দন সাহা এই স্তরে একটি স্পষ্ট বিভাজনরেখা দেখতে পেয়েছেন—কলকাতার কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের কলেজ। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহানগর হওয়ায় কলকাতায় এখনো কাজের সুযোগ প্রচুর। বিভিন্ন সংস্থা তাদের কাজ নানা রকম চুক্তিতে আউটসোর্স করে। তাদের দেওয়া টাকা সংসারের-দায়িত্ব-টানা একজন মানুষের পক্ষে অপ্রতুল কিন্তু একজন পড়ুয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কাঁচা পয়সার হাতছানিতে এবং আর্থিক প্রয়োজনে অনেকেই এসবের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কলেজে নামকাওয়াস্তে ভর্তি হয়ে থাকছে। ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি। কদাচিৎ তাদের ক্লাসরুমে দেখা যায়, পড়াশোনা কেমন হয় সহজেই অনুমেয়।

কলকাতার বাইরের কলেজগুলোয় এর ছোঁয়াচ এখনও লাগেনি, তবে তার জন্য পড়াশোনায় ঘাটতির কোনো খামতি নেই। উচ্চমাধ্যমিকের পর পছন্দের বিষয় না পেয়ে অনেকেই যাহোক-একটা বিষয় নিয়ে ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ ঠিকঠাক থাকলে সেসব বিষয় থেকেও তারা রসগ্রহণ করতে

—এরপর তিনের পাতায়

শীতের গ্রামীণ উৎসব ও তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত

রমজান আলি

এখনো পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে যথাযথ চাষবাসের উপর। যারা চাষ করতে পারছে, অল্প হলেও তাদের রুজি-রোজগার আছে। কিন্তু কৃষিকাজে সরাসরি অনুপস্থিতি যাদের তাদের সংকট ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। ভাগের মা গঙ্গা না পাওয়ার মতো অবস্থা এখন তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তো আর কথাই নেই। অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলে ফেলছে গ্রামের খেতমজুরের সন্তান। আজ পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত। তাদের কেউ কেউ এখন কেরল থেকে রুজিরোজগার করে এনেও গ্রামে ছোট্টো একটি পাকা বাড়ির মুখ দেখছে। সেই ব্যক্তিই হয়ে উঠছে পরবর্তী প্রজন্মের অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে অথবা গ্রামে থেকেই যে ছেলেটি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল, সে আজ পুরোপুরি বেকার। না ঘরকা, না ঘাটকা। সেই ছেলেটিই এতদিন তার পরীক্ষার খাতায় লিখে এসেছে মেলা হলো মানুষের মিলন মেলা। এক হয়ে যাওয়ার একটা সাংকেতিকতা বহন করে। অথচ আজ সেই মিলন অনুভূতি টিউনিং হচ্ছে না। দ্বন্দ্ব এটাই গ্রামের সেই মেলায় যদি কোন কিছু বিক্রি করতে পারত তাহলে হয়তো একটু রুজির মুখ দেখত। এতদিন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে ভব্যতা গায়ের চামড়ার মেখেছে, তা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে যেতে দিচ্ছে না। উৎসব হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু উৎসবের আনন্দ গায়ে মাখতে পারছে না।

প্রাচীন গ্রিসেও শীত আর বসন্ত ঋতুতে মানুষের মিলন মেলা হতো। শষ্যের দেবতা দিওনিসিওসের উৎসবকে কেন্দ্র করে ট্রাজেডি আর কমেডির জন্ম হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে মেলা হলো, উৎসবে লোকসমাগম, হৈ-চৈ ইত্যাদি। অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি ভাষায় 'মেলা' হলো অনেক, বহুসংখ্যক, ব্যাপক। যেমন, 'টগর ফুটিল মেলা'। সাঁওতালি ভাষায় আরেকটি অর্থে মেলা হলো 'বাইরের লোকজনের একত্র বসে আলাপ আলোচনার গৃহ বা কক্ষ'। সাঁওতালি শব্দের এই ব্যবহার যার থেকে বাংলা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে, এই তথ্যপ্রমাণই বলে দেয় রাঢ় ভূমিতে 'মেলা' শব্দটি যেমন প্রাচীন, এর ঐতিহ্যও তেমনি আদিমকাল থেকে।

শীতের প্রথম থেকেই বাড়িতে সোনার ধান ওঠে। দোফসলী জমিতে শাকসবজি ফসল, রান্না ঘরের ঝুড়ি ভরিয়ে দেয়। যারা ঋণ করে চাষ করে তারা কিছুটা ঋণ মুক্তির সুযোগ পায় এই সময়। যদিও সবটাই মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। শীতের শেষ থেকে বসন্তের মধ্যেই এখন গ্রামীণ মেলার বিপুল আয়োজন। সঙ্গে থাকছে সংগীতশিল্পীদের সংগীত পরিবেশনার নানা আয়োজন। শুরু হয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে মেলা। যেমন দক্ষিণ দামোদরে ঘনরাম, মকুন্দরাম, রূপরাম মেলা। এছাড়া পীরের মেলা, শ্মশান কালীঠাকুরের মেলা, বাউল মেলা এসব তো আছেই। এখন গ্রামেও হচ্ছে হস্তশিল্প মেলা। এই মেলায় মেদিনীপুর থেকে ছুটে আসেন পটুয়ারা কিংবা উত্তরের জেলা থেকে আসেন, বেতের কাজ করা নানা দ্রব্য নিয়ে শিল্পীরা। কিছুটা হলেও বিক্রিবাটা হয় বৈকি। ২০-৩০ বছর আগেও এইসব মেলাগুলিতে সব ধরনের এত ভোগ্যপণ্য সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু এখন কোনো কোনো মেলায় মোবাইল পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আধা মফস্বলে তথ্যপ্রযুক্তির বিবিধ দ্রব্যেরও বিপুল আয়োজন। অবশ্য কোনো কোনো মেলা সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখেছে যেমন, দামোদর নদীর সদরঘাটে ঘুড়ির মেলা, হাঁড়ি-দাড়ি-ঘুড়ির সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। মৃৎশিল্পীরা মাটির তৈরি তৈজস পত্র নিয়ে হাজির হয় এই মেলায়। মাটির হাঁড়ি, কালো ও লাল রঙের কলসী ছাড়াও মাটির তস্তা, তাওয়া, ঢাকনা ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য আজও গ্রামে-গঞ্জে ব্যবহার করা হয়। পিঠে পরবে পিঠে বানানোর জন্য মাটির বিশেষ তাওয়া, কলসী, সরা এসব মেলাতে পাওয়া যায়। গরমের মোকাবেলায় ঠাণ্ডা জলের জন্য মাটির কুজো, এমনকি ট্যাপকল বসানো মাটির কলসিও এখন সহজেই মেলে। অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে শাড়ির মেলা, সেখানে বিবিধ পোষাকেরও আয়োজন। সরাসরি ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে মিডিলম্যান না থাকায় কিছুটা সস্তাতেও এসব দ্রব্য মেলে।

একটি মেলাকে কেন্দ্র করে একটি উদ্যোগী যুবক আর কিছু না হলেও একটি জিলিপি-পাঁপড়ের দোকান অস্থায়ীভাবে বানাতে পারে। আর্থিক রুজিরোজগার তেমন একটা না হলেও এর মধ্যে আছে বিপণনের আনন্দ। তবে সবাই এই ধরনের দোকান দিতে চাইলে ক্রেতা পাওয়া মুশকিল। এখন প্রায় প্রতিটা গ্রামেই মেলার আয়োজন।

গ্রামীণ মেলার বড়ো সম্পদ তার সম্প্রীতি। সবাই সেখানে এসে হাজির হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ এ প্রশ্ন করে না যে, এটা হিন্দুর দোকান না কি এটা মুসলমানের দোকান। বিপরীত দিক থেকে দোকানের মালিকও জিজ্ঞাসা করে না বা তার মাথায় প্রশ্ন আসে না যে ক্রেতা কোন জাতের বা কোন ধর্মের প্রতিনিধি।

গ্রামীণ মেলা আজকের যুগে অনেকটাই আধুনিক হয়ে উঠেছে। মেলা শুরুর অনেক আগেই স্টল বরাদ্দের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ, মেলার আয়োজক কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা, আগে-ভাগে স্টল ভাড়া, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জমা দেওয়া এসব তো আছেই। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, কোথাও কোথাও স্টল ভাড়া বেশি দিতে হচ্ছে বলে তার দায়ভার চেপে যাচ্ছে ক্রেতার উপর। যা আগামী দিনে মেলার স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে নতুন কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির একটা আগামী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতেই পারে। মেলাকে কেন্দ্র করে সেই লোকায়ত সংগীত এখনও বয়স্কদের মুখে শোনা যায়—"দাদা পায়ে গড়ি রে মেলা থেকে বৌ এনে দে।" বা "কিনে দে রেশমি চুড়ি/ নইলে যাবো বাপের বাড়ি,/ দিবি বলে কাল কাটালি,/ জানি তোর জারিজুরি"। মেলায় বৌ পাওয়া যায় না ঠিকই তবে যুবক-যুবতীদের নিজেকে দেখানো এবং অপরকে দেখার একটা গভীর মনস্তত্ত্ব কাজ করে বৈকি। সেলফিতে ছবি তোলা এখন তাদের নিজেকে দেখানোর অন্যতম এক মোবাইল মাধ্যম। কিনি আর না কিনি গায়ে চাপিয়ে দুটো সেলফি তুলতে বাধা কোথায়। ক্রয়ক্ষমতা না থাকলেও ছবির মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণ তো হলো। একসময় গৃহজীবনে আটকে থাকা বধূ মুক্তির স্বাদ পেত মেলায় গিয়ে। আজকের যুগে গৃহজীবনে সেই অসূর্যম্পশ্যা নারীর অভাব। তবুও মেলাকে কেন্দ্র করে সেই বধূ কিংবা ছেলেমেয়েদের একটা আদর-আবদার থাকে বৈকি। মেলাকে কেন্দ্র করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের আমন্ত্রণ থাকে। পারিবারিক জীবন সত্যিই উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। তখন মেলার এরিয়া ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ক্রয়-বিক্রয় হয়। উৎসবের আনন্দে তখন গৃহকর্তা ছাড়া আর কারো মাথায় অর্থ ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ কাজ করে না।

শিক্ষা : গতি যখন দুর্গতি

—*দুয়ের পাতার পর*

পারত। সেটা হচ্ছে না।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন শিক্ষানীতির নিয়ম-কানুন। চার বছরের স্নাতক কোর্সের পাশাপাশি পুরনো কোর্সেরও ছাত্র-ছাত্রী আছে। সেখানেও দু'রকম ভাগ। সুতরাং পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে এই তিন ধারারই। পরীক্ষা নিতেই বছরের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হচ্ছে। পর্যাপ্ত টিচার ও ক্লাসরুম থাকলে এতে সমস্যা হত না। সেসব না থাকায় পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। নতুন নীতিতে ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের, বিশেষত মানবীয়বিদ্যার বিষয়গুলিতে, কোথায় কিভাবে ইন্টার্নশিপ হবে তার কোন রূপরেখা নেই। তাই এগুলো মন ভোলানো যা-হোক-একটা-কিছু দিয়ে গোঁজামিল দেওয়া হচ্ছে।

অধ্যাপক রাজেশ মজুমদার দুটো সিরিয়াস বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটির প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে কেটে যাবে বলে তিনি আশা করেন, তবে দ্বিতীয়টি সুদূর ভবিষ্যতে বড় বাজে ফলাফল নিয়ে আসবে। প্রথমটি হল রিল। শিক্ষার্থী সমাজ এখন রিলে ডুবে আছে, মত্ত হয়ে রিল দেখছে ও বানাচ্ছে। এই আসক্তি ক্লাসরুমের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী রিল দেখার অভ্যাস মনঃসংযোগের ক্ষেত্রে চরম সমস্যা নিয়ে এসেছে। তবে তাঁর আশা, এটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে শীঘ্রই। তবে দ্বিতীয় কারণটি কিন্তু সত্যিই ভয়ংকর। শিক্ষার বি-রাজনীতিকরণ। আপাতদৃষ্টিতে এটা ভালো, অভিভাবকদের পক্ষেও আরামদায়ক। কেননা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আমরা ছাত্র রাজনীতিতে রক্তক্ষয় দেখে দেখে শিহরিত। কিন্তু রাজনীতির মত একটা উৎকৃষ্ট পন্থাকে পরিশ্রুত করার বদলে তাকে তুলে দেওয়া অবিবেচকের কাজ। এর সবচেয়ে বড় শিকার সংরক্ষণের আওতার বাইরে থাকা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। রাজনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলনকে হাতিয়ার করে তারা নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরত, যে কারণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সজাগ থাকতে হত। সেই জাগরণের ডাক আজ স্তিমিত।

অধ্যাপক নন্দন সাহার আরেকটি গর্ববেক্ষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নতুন শিক্ষানীতির কারণে অধ্যাপকদের নিজেদের বিষয়ে পড়ানো ও গবেষণা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে পড়াতে হয় এবং রোজ রোজ প্রচুর কাগজপত্রের খতিয়ান পেশ করতে হয়। নইলে তাঁদের পদোন্নতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। আগে ক্লাস মিস হলে বা কোন টপিক বুঝতে না পারলে শিক্ষার্থীরা সচ্ছন্দে টিচারদের কাছে যেতে পারত। ক্লাসের বাইরে অনেকেই কলেজের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সন্ধে অব্দি টিচারদের কাছে পড়া বুঝে নেওয়া, নোটস নেওয়ার কাজ করতে পারত। আজ যদি কোন উৎসাহী শিক্ষার্থী সে চেষ্টা করে এবং যদি টিচারের তাকে সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছাও থাকে তবুও সময়ের অভাবে তিনি তা করতে পারছেন না।

আগাছার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর দশা সবচেয়ে শোচনীয়। বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের নামমাত্র মাইনেতে টিচার হিসেবে রিক্রুট করা হয়। পড়ানোর চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষার্থী জোগাড় করে আনায়। অধিকাংশ কলেজে ঠিকঠাক ল্যাব নেই। পরিদর্শনের দিন অন্য কোনো জায়গা থেকে সরঞ্জাম এনে কাজ মেটানো হয়। শেয়ালের কুমিরছানা দেখানোর মতো একই সরঞ্জাম কলেজে কলেজে মুখ দেখায়।

পাশাপাশি, একথা আজ কারোরই অজানা নয় যে এসএসসি সহ আজস্র নিয়োগ পরীক্ষার স্থবিরতা ও সীমাহীন দর্নীতি তরুণ প্রজন্মের বিপুল অংশকে শিক্ষাবিমুখ করে তুলেছে।

এরই মাঝে অল্প হলেও কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সিস্টেমের ভূমিকা স্বল্প। তবুও কোথাও কোথাও ক্রিয়াশীল। অধিকাংশ কলেজ ইন্টার্নাল অ্যাসেসমেন্ট যত্ন নিয়ে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এখনো এতটা অব্যবস্থা গ্রাস করেনি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের লাইব্রেরী অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ এক বিরাট সুযোগ। তবে এ সবই আশার ঝিলিক মাত্র, দিশা দেখানোর নিষ্কম্প আলোকরেখা এখনও দৃষ্টিসীমার বাইরে।

পরিশেষে একটা কথাই বলার আছে। শিক্ষার সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। মন-ভোলানো আশাবাদ নিরর্থক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন এটা স্বীকার করেই মেরামতিতে হাত লাগাতে হবে। সেটাও অবিলম্বে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক ক্ষতিও হয়ে গেছে। রাতারাতি এ ক্ষত সারবেও না। সমূহ সর্বনাশের কবল থেকে বাঁচতে সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সদিচ্ছার সঙ্গে নীতির রূপায়ণ শুরু হোক এখন থেকেই।

গ্রাম-বাংলার নবান্ন

অতনু ঘোষ

নবান্ন শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নতুন অন্ন। অর্থাৎ অঘ্রাণের সোনালী ক্ষেতের নতুন ধান ভেঙে অন্ন গ্রহণ করাই হলো নবান্নের এক এবং অদ্বিতীয় রীতি। মূলত গ্রাম-বাংলার কৃষক ও খেতমজুরদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো মাঠের সোনালী ধান-কে গোলায় তোলার আগে এ এক হৃদয়ের উৎসব।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায় স্পষ্টতঃ লিখেছেন—

"বোশেখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ,
ভাদ্দর, আশ্বিন,-
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না
কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু
বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল কোরে কভু
সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে,- একি!
এবার 'ত নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক্-কাটা মাঠ
জুড়ায় চাষার আঁখি।"

এও কি স্বদেশের জন্য লড়াই করতে সীমান্তে যাওয়া যেকোনো যোদ্ধার থেকে কম কোনো সংগ্রাম? কৃষি-নির্ভর এই ভারতে কৃষকদেরই অন্নদাতা বলা হয়। তাদেরই রক্ত, ঘাম ও শ্রমের ফসল মানুষের মুখে খাবার হিসেবে রচিত হয়। বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই পাঁচ মাস কতখানি হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় কৃষকের যে কাটে দিন তা একমাত্র এই বিপুল ধরণী জানে। পাঁচ মাসের এই শ্রমের ফসলের উপর নির্ভর করেই মূলত গ্রাম-বাংলার পরিবারগুলো সারাবছর বেঁচে থাকে। তাই কৃষকের কাছে এই পাঁচ মাস সংগ্রামের, বিপ্লবের, লড়াইয়ের। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশ্বউষ্ণায়ন, কখনো খরায় শুকিয়ে যায় ফসল, কখনো বন্যায় ভেসে যায়, তারপরও রাজনীতির কারবারি ও পুঁজিবাদীদের শোষণ ও লুঠের বাণিজ্য, একত্রে এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়।

আর সেই লড়াইয়ের শেষে যখন

অঘ্রাণের ক্ষেত সোনার রঙের মতো চকচক করে, কৃষকদের কাছে সেই আনন্দ যুদ্ধজয়ের সোনার মুকুটের থেকেও কম কিছু না। আর সেই আনন্দ উদযাপনের নামই নবান্ন। নতুন ধানে খুশির পাতে নতুন অন্ন। আসলে নবান্ন গ্রাম-বাংলার কৃষক মজুরদের ঘরে ঘরে আনন্দের উৎসব। সেই উৎসব উদযাপন মূলত হিন্দু শাস্ত্র ও রীতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা অথবা লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা। আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ। উৎসবের দিন সক্কাল সক্কাল পরিবারের সকল সদস্যদের স্নান সেরে একসাথে অন্নপূর্ণার আরাধনা তারপর জমিয়ে থালাভর্তি ভালোমন্দ প্রসাদ—কলা, চিঁড়ে, মণ্ডা, মিঠাই, নারকেল, গুড়, নাড়ু, দুধ, ক্ষীর, মালাই, ফল এককথায় যেন ভুড়িভোজন। তারপর দুপুরেও ভাতের পাতে পাঁচ/সাত রকমের ভাজাভুজি, নবরত্ন তরকারি, পুকুরের নানারকম মাছের পদ সে যেন এক দক্ষযজ্ঞ। পরের দিন অর্থাৎ বিসর্জনের দিন মাংস ভাত, বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রকম লৌকিক অনুষ্ঠান, যাত্রা - নাটক - কবিগান - রামায়ণ - শাক্তপদাবলীর পালা এই সবকিছু নিয়ে যেন মুখর হয়ে থাকে বাংলার প্রতিটি গ্রাম।

যেখানে ধর্ম-জাত ও বিভাজনের থেকে একে অপরের সাথে খুশির উৎসবে সামিল হওয়া, আত্মীয়তার আপ্যায়ন, সকলে মিলে হৃদয়ের মেলবন্ধনে নতুন ফসলকে বরণ করে নেওয়াটাই আসলে এ বাংলার রীতি, যার নামই নবান্ন। যতদিন কৃষক থাকবে, জমিতে মাটি থাকবে, আর ক্ষেতের ধান গোলায় উঠবে ততদিন বেঁচে থাকবে এই মেলবন্ধনের উৎসব নবান্ন। ততদিন বেঁচে থাকবে গ্রাম আর শেষ অব্দি জয়ী হবে কৃষকেরাই। রাজনীতির কারবারি, পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজরা প্রতিদিন এই মেলবন্ধন-কে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত চালালেও শেষ অব্দি ব্যর্থ হবে। অঘ্রাণের মাঠে নবান্নের ফসল আজীবন কৃষকদের মুক্তিযুদ্ধের নিশানের মতো পতপত করে হাওয়ায় দুলবে।

টেস্ট পেপার বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ ডিসেম্বর, গলসী : ভারতের যুব ফেডারেশনের গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষথেকে ৬০ জন মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের এবিটিএ টেস্টপেপার বিতরণ করা হয়। বক্তব্য রাখেন যুব নেতা দেবব্রত দাস, মনসিজ হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা রাজীব সাম, শুভেন্দু বিশ্বাস, সৌম্যদীপ সানা, সোনা মুখার্জী, শিক্ষক সংগঠনের নেতা হালিম মণ্ডল প্রমুখ।

চরম রক্ত সংকটে পাশে কৃষক নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ডিসেম্বর : চরম রক্ত সংকটে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে কালনার একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন একজন সন্তানসম্ভবা প্রসূতি। প্রসূতি সুপর্ণা ধারার বাড়ি কালনা-২ ব্লকের অকরপাড়া গ্রামে। তার বি-পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন হয়। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না থাকায় তখন ডোনারের সন্ধান করতে থাকেন সুপর্ণার আত্মীয়-স্বজন। খবর পাওয়া মাত্রই কালনা-২ ব্লকের কৃষক সভার সম্পাদক নবকুমার বাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এসে রক্তদান করেন।

দেনার দায়ে আত্মহত্যা খেতমজুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ ডিসেম্বর : পাওনাদারদের নির্মম তাগাদার জেরে রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন একজন খেতমজুর। মৃত সমীর হাজারার (৪০) বাড়ি মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুসুমগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরা গ্রামে। মৃতের নিকট আত্মীয়রা জানান সমীরের তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বহুল ব্যাংক সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ঋণ হয়ে গিয়েছিল। ৭ ডিসেম্বর রাতে নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালে পাঠায়।

আদিবাসী ফুটবলার গড়ার লক্ষ্যে সগড়াই ক্লাব

বিদ্যুৎ ভৌমিক : সমাজে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মেয়েদের প্রতিভার অন্বেষণে অজ গাঁ থেকে তুলে এনে জেলা ও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় তাদের সুযোগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে এগিয়ে এসেছে খণ্ডঘোষ ব্লকের সগড়াই অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। এই ক্লাবে খেলে মহিলা ফুটবলার মল্লিকা টুডু অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে রাজ্য দলে সুযোগ করে নিয়ে রাজ্যের হয়ে নানা প্রান্তে খেলে সুনাম অর্জন করেছে। এই ক্লাবের ৪ মহিলা ফুটবলার কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কন্যাশ্রী কাপে খেলার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। এরা হলেন সুজাতা রায়, উর্মিলা টুডু, শ্রীমতী বাস্কে ও শ্রাবণী হাঁসদা। প্রথম তিন জন খণ্ডঘোষের সগড়াই গ্রামেরই মেয়ে। শ্রাবণী হাঁসদা ওই ব্লকের বাদুলিয়া গ্রাম থেকে উঠে এসেছে। নিম্নবিত্ত অসহায় গরিব পরিবার থেকে উঠে এসে এরা নিজেদের জাতকে চিনিয়ে জেলার ক্রীড়া জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

খণ্ডঘোষের সগড়াই ক্লাবের সম্পাদক যুধিষ্ঠির হাঁসদা ক্লাবের সুনাম অর্জনে প্রাণপাত করে চলেছেন। ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রসূন মণ্ডল ক্লাবের জন্য ও ক্লাবের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন দলে খেলার সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছেন। বলেন, ক্লাবের ৪ মহিলা ফুটবলার ফুটবলের মক্কা কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সুযোগ পেয়েছেন। এমনকি ফুটবলার সুজাতা রায় দিল্লিতে খেলার সুযোগ লাভ করেছেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতি অংশের অত্যন্ত হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে হয়েও তারা ব্লক ও জেলায় প্রতিনিধিত্ব করেও রাজ্য দলে খেলে ক্রীড়াঙ্গনে আলোড়ন তুলে দেশের সম্মান বাড়াচ্ছেন। এও কম গৌরবের কথা নয়।

চাষির মাথায় বজ্রাঘাত

—প্রথম পাতার পর

দপ্তর সূত্রে জানা যায় এবার জেলায় চাষ হয় তিন লাখ ৬৭ হাজার একর জমিতে। এর মধ্যে গোবিন্দ ভোগ ৫০ হাজার হেক্টরে চাষ হয়। একে এবারে দর কম তার ওপর পাকা ধানে মই। চাষির আত্মহত্যা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই এমনটাই জানালেন রায়নার কালীদাস সেন। গলসীতে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

জেলার পাঁচ হাজার হেক্টর সবজি চাষ জলের তলায়। নাদনঘাট, পূর্বস্থলি, কালনার চাষিদের মাথায় হাত। বিঘার পর বিঘা ফুলকপি, বাঁধা কপি, বেগুন, পটল, শাক সবজি সব পচে যাওয়ার আশঙ্কায়।

এদিকে প্রতিটি ব্লকে প্রতিনিধিত্ব মূলক ডেপুটেশন দেন সাড়া ভারত কৃষক সভা। তাদের দাবি আলু বীজ সরকারকে বিনা মূল্যে দিতে হবে। যে ধানের ক্ষতিপূরণ হয়েছে তাতে বিঘা পিছু ১৫০০০ টাকা, আলুর জন্য বিঘা পিছু ২০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আবার কিসান মান্ডিগুলিতে ধান কেনার গতি কমে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ খাদ্য দপ্তরের। গতবার থেকে এবার জেলার ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ালেও সেভাবে ধান কেনার গতি কমে যাওয়ায় আশঙ্কায় দপ্তর।

পাখি-চোখ-৫৫

রত্না রশীদ

বাংলার যুবশক্তি আজ লাগাতার দিনের পর দিন গ্রাম শহর গঞ্জ গলি—সর্বত্র পরিক্রমা করে চলেছে বিষ বাতিল করে অমৃত উদ্গমের জন্য। শত শত হাজারে হাজারে মানুষ উষ্ণ অভ্যর্থনায় স্বাগত জানাচ্ছে এই যুবশক্তিকে। মানুষের আশা, বাংলার বুকে নতুন আলোর ভোর আনবে এই যুবশক্তি সম্মিলিত আন্দোলনের জোরে। স্নেহের মীনাক্ষী মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা-জোড়া এই যে আন্দোলনের ঢেউ তাতে সামিল না হয়ে পারেনি অবস্থান ও বয়স নির্বিশেষে নারীপুরুষ শিশু-কিশোর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। শাঁখ বাজিয়ে ফুল ছিটিয়ে আপামর জনগণ বরণ করছে, সম্মানিত করছে এই তারুণ্যের জোয়ারকে।

বলতে পারবো না এই উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত জনতার সবাই এই যুবশক্তিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে কিনা। এমনটা না-ই হতে পারে। কিন্তু এই যে জনসংযোগ, এর একটা স্বতন্ত্র অর্থ আছে। দেশে ও রাজ্যে যে জঘন্যতম মাৎস্যন্যায় চলছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত আমজনতার বৃহদংশ। অনেকেই নিজের ক্ষোভ, কষ্টকে সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরতে পারেন না লজ্জা ভয় ও আতঙ্কে। এই যে যুবশক্তির রাজ্যজোড়া পরিভ্রমণ, এতে করে মানুষ নিজের বুকে চেপে রাখা কষ্ট, অত্যাচার, মার খেয়ে মার হজম করার কাহিনি সাহস করে খুলে বলবার সুযোগ পেল। আশ্বাস পেল মনে মনে, আমাদের কথা শোনারও কেউ তো আছে, আতো ভয় আর সঙ্কোচের প্রায়োজন নেই। এই তো হাত বাড়ালেই হাতের ছোঁয়া পাচ্ছি, আমি আর অকারণ ভয় করতে যাব কেন?

একতার ডাক দিয়ে যাব আমরা—পথের ধুলোয় সঞ্চিত হবে আমাদের সবার শরীর ও মন, কসমেটিকস্ লাগে না আমাদের এই পথের ধুলোর কল্যাণে, ধুলোর মানুষ সবাই মিলে ঐক্যের ঝড় তুলে ধূলি ধূসরিত হবো হাতে হাত বেঁধে। রচিত হবে অভেদ্য মানব শৃঙ্খল। সাধারণ মানুষ সবাই খেটে খায়, হায়না গোত্রের অত্যাচারীরা সেগুলো খুঁটে নিয়ে যায়। পরিশ্রম ক্লান্ত শরীরে ভুখা পেটে চোর ডাকাত ছ্যাঁচোড় দলের অশ্লীল মহোৎসব দেখে। ভেতরের জ্বলা আগুন চোখের জলকে বাষ্প করে উড়িয়ে দেয়। সে সুযোগ পায় না অত্যাচারীর অতি বাড়াকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবার। এই যে যুবশক্তির রাজ্যপরিক্রমা এটা বহু মানুষকে প্রাণিত করবে নিজের ভেতর চেপে রাখা কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণার পাহাড় উগড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সঠিক 'অস্ত্র' ধরার। কারণ, সবাই জানে লাখো কা ভূত হাথো সে নেহি মানতা। 'অস্ত্র' মানে কেবলই লাঠি সোঁটা বল্লম বর্শা গুলি বন্দুকই যে নয়, এটা বলাই বাহুল্য। মীনাক্ষীর এক একটা ভাষণ হলো সমৃদ্ধ তূণীর, এক এক মানুষের জ্বলন্ত কলম হলো প্রকৃত তলোয়ার, লাখো মানুষের ঐক্যবদ্ধ মিছিল হলো প্রতিবাদের প্রকৃত অস্ত্রভাণ্ডার। আমরা আছি, থাকবো, মারলেও মরবো না, মরবে না আমাদের শুদ্ধ চেতনা।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—যুবশক্তি চলিয়াছে প্রকৃত সংগ্রামে।

(চলবে)

আত্মঘাতী কৃষক পূর্বস্থলীতে

—প্রথম পাতার পর

রয়েছে বিধবা মা, স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে। এবছর ধার দেনা করে দু-বিঘা জমিতে উন্নত আলু বীজ দিয়ে চাষ করেছিল। তাছাড়াও ধান, সর্ষে এবং শসা চাষ ছিল তার। কিন্তু সম্প্রতি বৃষ্টিতে তার চাষের সমস্ত জমিতে জল জমে যায়। শুক্রবার মাঠ থেকে রূপ সনাতন ঘুরে আসার পর সে হতাশ হয়ে পড়ে। জমিতে কাটা ধান ভাসছে। সর্ষের জমিতে জল থই থই করছে। শসার জমিও প্লাবিত। আলুর জমিতে এত জল জমেছে যে, জমি আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

কয়েকজন নিকট বন্ধুর কাছে আর হতাশার কথা বলেও ফেলে সে। রাতে তেমন কিছু খাওয়া দাওয়া না করে শুয়ে পড়ে। নিভৃতে কখন সে চলে গিয়ে বাড়ির নিকটবর্তী একটি আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে। গ্রামের কৃষক সমর ঘোষ পরদিন সকালে মাঠের বীজতলা দেখতে গিয়ে রূপ সনাতনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ছিল সে।

কালনায় দুই সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম)-এর দরদী সুখময় দাসের (৭১) জীবনাবসান হয় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৬ ডিসেম্বর বিকালে। তিনি বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্ট, মধুমেহ, প্রেসার প্রভৃতি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি নাতনি বর্তমান। ৭ ডিসেম্বর সকালে তার মৃতদেহ সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান, সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, মহিলা নেত্রী জনা মুখার্জি, সিপিআই(এম) কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি, অরুণাভ চক্রবর্তী, কেশবচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। সেখান থেকে মৃতদেহ কালনা শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ দরদী অরুণ মজুমদার (৭০)-র জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই বৌমা এবং নাতি-নাতনি বর্তমান। তার মৃতদেহ সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির দপ্তর ধাত্রীগ্রামে আনা হয়। শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, কৃষক নেতা সুকুল শিকদার, আলিম শেখ, বীরেন ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ। কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করা হয়।

নতুন করে এঙ্গেলস পাঠ

—দুয়ের পাতার পর

বিশ্লেষণ করে দেখান। এঁরা শ্রেণি সমন্বয় করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এঙ্গেলস দেখান যে ধনতন্ত্রের ধ্বংস ছাড়া কখনোই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কারণ পরিবার, গ্রাম ও রাষ্ট্র সমাজবিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্র অনুযায়ী নেতির নেতি না হলে নতুন কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে একমাত্র ধনতন্ত্র ধ্বংস করেই। তবে এঙ্গেলস সেই সঙ্গে এটাও স্মরণে রাখতে বলেছেন—বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান সেগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে। এখানেই মানুষ প্রথম হয়ে উঠবে প্রকৃতির প্রকৃত, সচেতন প্রভু কারণ সে এখন তার নিজের সামাজিক সংগঠনের কর্তা। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অসাধারণ স্ফূরণ শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় তথা সমস্ত কুসংস্কারের অবসান ঘটায়।

১৮৮৩ সালে কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই ছিলেন মার্কস ও মার্কসবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। মার্কসের যাবতীয় লেখার নতুন সংস্করণের কাজ তাঁকেই করতে হয়। ১৮৮৬-১৮৯৪ সালের ভিতর এঙ্গেলস দাস ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কাজ শেষ করেন মার্কসের কিছু পাণ্ডুলিপির সাহায্যে। ১৮৮৪ সালে নিজের বই 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ সালে লুডভিক্ ফয়েরবাখের উপর গ্রন্থটি শেষ করেন। সেই সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রাখতে হয় জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট ও তার অনুগামীদের সঙ্গে যাতে মার্কসের ভাবমূর্তি বজায় রেখে সারা পৃথিবীতে বিপ্লবের কাজকে বিস্তৃত করা যায়। ১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট এঙ্গেলস লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে যান দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক, বন্ধুত্বের ঐতিহ্য। আমার জার্মান-নিবাসী পুত্র সাবর্ণের কাছে জেনে ভালো লাগলো যে, এ বছর সে দেশের বিভিন্ন শহরে এঙ্গেলস-ডে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের এখানে নতুন করে এঙ্গেলস সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চার হলে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা